হিমজল

সুকান্তি দত্ত

রোবটের বেঙ্গলি কী?

হুঁ।

আবার হুঁ? তুমি কি কালা?

চুপ করে তাকিয়ে থাকলাম রিন্টুর দিকে। অনুভব করছিলাম যে-কোনো মুহূর্তে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। রাগভাব ফুটে উঠছিল কি চোখেমুখে? কিন্তু রিন্টু মোটেই পাত্তা দিল না আমার রাগ - টাগ। ফের বলল, রোবটের বেঙ্গলি কী?

যন্ত্রমানব

তোমার বেঙ্গলিতে খুব নলেজ, না?

ওই, একটু - আধটু।

আমার ইংলিশের নলেজ আছে, বেঙ্গলিতে নেই, হিন্দিও জানি— কথা শেষ করেই 'ধুম মচা লে' বলে চিৎকার করে গানের মতো কিছু একটা করবার চেষ্টা করল নেচে নেচে।

আমি রিন্টুর পিসেমশাই। আমার একমাত্র শালার একমাত্র ছেলে। দুইমাত্র সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা আজকেই নিকাশ হবে। বোধহয় হয়ে গেছে এতক্ষণে। শালা - বৌ নার্সিং হোম গেছে অ্যাবরশন করাতে। সঙ্গে গেছে তার ননদিনি। তাই দুপুরের তিন - চার ঘন্টা রিন্টুর দায়িত্ব আমার। ঘন্টা তিন কেটে গেছে। মনে হচ্ছে, জীবনে এর থেকে কঠিন দায়িত্ব পালন করিনি আগে।

একটা কথা চালু আছে, শুনেছি অনেকের মুখে, ফুল আর শিশু যারা সহ্য করতে পারে না তারা মানুষ খুন করতে পারে। রিন্টুকে নিয়ে ঘন্টা তিন কেটে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে সম্ভাব্য খুনী হওয়ার অপবাদও সহ্য করে নেয়া যায়। তবে সব শিশুর ক্ষেত্রেই আমার যে এরকম অনুভূতি তা নয়, আজকের মতো মনোভাব এর আগে কারও ক্ষেত্রে হয়েছে বলে মনে পড়ছে না।

তুমি আমার পি. এম.?

কী?

পি. এম.?

জান না?

রিন্টু ছোটো চোখজোড়া আরও ছোটো করে খিকখিক হাসছে। ক্লাস ফোরে পড়ে। নামী স্কুল। স্কুলবাসে যাতায়াতেই রোজ চলে যায় দু ঘন্টা। বেশ ফর্সা, নাদুসনুদুস চর্বি ফোলা চেহারা।

আচ্ছা রিন্টু, তুমি একটু চুপ করে বসবে?

আগে বল তুমি পি. এম. কিনা?

ও! আচ্ছা, পি. এম. পিসেমশাই।

না, তুমি পাগলা মদন!

'পাগলা মদন', 'পাগলা মদন'— হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করে। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে কিছু গাড়ি, বন্দুক, ঘোড়া, সৈন্য, ডাইনোসোর, এরোপ্লেন ইত্যাদি। কোনোটায় লীল - নীল আলো জ্বলছে, কেউ বা ভেঙেচুরে ছিটিয়ে আছে, নাচের তালে পায়ের ধাক্কায় কেউ বা ছিটিয়ে যাচ্ছে। পেট থেকে খাবলে বের করা তুলো উড়ছে বাতাসে, কেউ আবার 'গ্যাঁও, গ্যাঁও' শব্দ করছে। আমার বইয়ের আলমারির একটা কাঁচ ভেঙেছে ইতিমধ্যে, আরও কটা ভাঙবে জানি না কারণ রিন্টুর হাতে আবার বল। খাটের ওপর নজর পড়তে দেখি একটা আধখাওয়া বিস্কুট ঘিরে পিঁপড়েরা সভা করছে!

বলটা টিপ করলে ছুঁড়লে বইয়ের আলমারির মাথায় যেখানে খেলনা - রোবট রাখা আছে, উচুঁ আলমারি নয়, মেঝে থেকে ফুট পাঁচেক। রোবটটাকে আমিই ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওখানে তুলে রেখেছিলাম। বড়ো বিকট শব্দ করে রোবটটা। আমার আবার শব্দ - ফোবিয়া আছে, বিকট আওয়াজ সহ্য করতে পারি না মোটে।

বুঝলাম ওটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত, বল ছুঁড়তেই থাকবে। ওর পিসি, ঘরদোরের অবস্থা, কাঁচভাঙা— এসব অনাসৃষ্টির জন্য দায়ী করবে আমাকেই, বলবে, একটা বাচ্চাকে সামলাতে পার না!

ভাবলাম, ব্যা টার ঘেঁটি ধরে ধমক লাগাই, কিন্তু তাতে দমার পাত্র নয় এ, উলটে আরও বেশি হাঙ্গামা শুরু হবে। তা হলে? বেশ চেষ্টা করা যাক একটা।

খুব মোলায়েম স্বরে ডাক দিলাম, রিন্টু? ও রিন্টু সোনা?

চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে ঘুরে তাকাল একবার, বল টিপ করতে করতে বলল, কী?

তুমি কী খেতে ভালোবাস?

কেন?

একটা কাজ করলে তা-ই কিনে দেব।

কী কাজ?

খুব বুদ্ধিমান ছেলেরা ছাড়া পারে না।

কী?

স্ক্রু-ডাইভার দিচ্ছি, ওই রোবটটাকে খুলে ফেলে আবার জোড়া লাগাতে হবে।

কী দেবে?

কী খেতে চাও বল।

খাওয়ার জিনিস নয়—

তবে?

একটা আসল বন্দুক।

আসল বন্দুক! কী করবে? বাঘ মারবে না পাখি?

ফাস্টে বাপিকে, দ্যান - মাম্মিকে—দনাদন!

বলটা গিয়ে লাগল রোবটের গায়ে, বিকট শব্দ করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। হাততালি দিয়ে নাচছে রিন্টু।

কানে হাত চাপা দিলাম আমি।

এক উৎসবের উল্লাস থেকে ফের আর এক উৎসবের প্রস্তুতি, দল বেঁধে ওরা এসেছিল। ছেলে, আধবুড়ো, দু-একজন বুড়োও। কালীপুজোর এবার নাকি রজতজয়ন্তী। মোটা চাঁদা দিতে হবে। এই ফ্ল্যাটবাড়ির প্রত্যেক পরিবার পিছু এক হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি একেবারে ফুটপাতের কায়দায় দরদস্তুর শুরু করলাম। আড়াইশো টাকা— শেষ পর্যন্ত রফা হল পাঁচশো। অবশ্য মুখ চালাতে হল প্রায় আধঘন্টা। এবার নাকি পাঁচ লাখ টাকা বাজেট। চাঁদা ধরা হয়েছে এক লাখ, বাকি চারলাখ স্পনসারশিপ ও সুভেনির বাবদ।

চারদিকে বন্যা চলছে—

হ্যাঁ, সে দেব কিছু— নীল জিনসের ওপর কালো টি শার্ট ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, এ বোধহয় সেক্রেটারি, বলল, প্রতিবছর লেগে থাকে নয় বন্যা নয় ভূমিকম্প নয় ইয়ে—গতবছরও পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম বন্যাত্রাণে।

কত বাজেট ছিল—

অ্যাঁ। তা দু লাখের ওপর।

ও।

সত্যি কত বড়ো দান! দু লাখ থেকে পাঁচশো টাকার ফূর্তি কমিয়ে ফেলা কম কথা— এত আস্তে বললাম কথাগুলো ঠিকঠাক শুনতে বোধহয় পেল না ওরা, ওদের শুনিয়ে বলার সাহসও নেই আমার।

কিছু বললেন?

না, আপনারা ভালো কাজ করছেন এইসব দান-টান করে।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি বেশ মুরুব্বির মতো হাসল, বিলটা আমার হাতে ধরিয়ে বলল, এবার ভাবছি কাঙালি-ভোজন করাব। টাকাটা ডিউ থাকবে?

না, নিয়ে যান।

ওরা চলে গেলে নিজের মনে গজগজ করছিলাম। ইলা মুখঝামটা দিয়ে উঠল, স্পষ্ট না করে দিতে পারলে, সে বেলায় মিউমিউ! যত বীরত্ব বউয়ের সঙ্গে। আমি চুপ। মনে মনে বলললাম, সে বীরত্বটুকুও যদি পারতাম, তা হলে হয়তো সংসারে অন্তত একটু স্বস্তি মিলত।

স্পষ্ট করে না করে দেব, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা? ইলা বলল, কেন নীচের ফ্ল্যাটের রবিনবাবু পরিষ্কার বলে দিয়েছেন দুশো টাকার এক পয়সা বেশি দেব না, নিতে হয় নাও— সুড়সুড় করে নিয়ে চলে গেছে।

আমি চুপ করে থাকি, রবিনবাবুর সঙ্গে আমার তুলনা! উনি পার্টির লোক, অনেক বড়ো বড়ো কানেকশন, আর আমি তো ভালো করে পাড়া দূরের কথা ফ্ল্যাটবাড়ির সবাইকেও চিনি না। নিতান্ত অসামাজিক জীবন। ক্লাবে গিয়ে তাস পেটাই না, বারোয়ারি পুজো কমিটিতে থাকি না, নির্বাচনের মিছিল -মিটিং, একটাতেও পাওয়া যাবে না আমাকে। অফিস থেকে ফিরে বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে বসে থাকি। বইয়ের বদলে বউ হলেও হয়তো অপদার্থ থেকে পদার্থ হয়ে উঠতে পারতাম!

এই রবীন্দ্রকাননে এসেছি তা প্রায় আট বছর হয়ে গেল। আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির নাম গীতাঞ্জলী অ্যাপার্টমেন্ট। পাঁচতলা বাড়ির প্রতিতলায় চারটে করে ফ্ল্যাট। তিনতলায় আমরা। আশেপাশে আরও তিনটে ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে। আমাদেরটাই সবচেয়ে পুরোনো। কো- অপারেটিভ তৈরি করে সবাই মিলে একটু সস্তায় জমি কেনা হয়েছিল। অফিসের সুরঞ্জন ছিল কো- অপারেটিভের, ওর উদ্যোগে ঢুকেছিলাম, আর কেউ আমার চেনা - জানা নয়। এতদিনেও ঠিক চেনা-জানা হল না। একেবারে ঘরকুনো অসামাজিক জীব হলে যা হয়।

মেইন রোড থেকে গলি বেয়ে এক মিনিট হাঁটলেই গীতাঞ্জলী। রবীন্দ্রকাননে গীতাঞ্জলী। এই পাড়া এবং বাড়ির যারা নামকরণ করেছিলেন তাদের রবীন্দ্রপ্রেম নিয়ে সন্দেহ কী? পাশের বাড়িগুলো কোনটা লিপিকা, কোনটা বা সোনারতরী। যে প্রমোটর মশাই এই বাড়িগুলো তৈরি করেছেন, এখান থেকে মাইলখানেক দূরে মেইন রোডের ধাকে তার প্রাসাদোপম বাড়ি, ওর বাড়িটার নাম 'সঞ্চয়িতা' হলে মন্দ হত না!

গত আট বছরে রবীন্দ্রকাননে পঁচিশে বৈশাখ পালন হতে দেখিনি। তবে দুর্গাপুজোয় তিনদিন ধরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়— মেয়ে - বউয়েরা গ্রুপে ভাগ হয়ে বেশি হিন্দি কম বাংলা গানের অন্তাক্ষরী করে, কুইজ, রসগোল্লা খাওয়া প্রতিযোগিতা—এইসব। আমার ছেলে এবার কুইজ-এ প্রাইজ পেয়েছে। জলসাও হয়, ছেলেকে বললাম, এবারে কী হল জলসায়? সে বলল, প্রথমে ন্যাকা - ন্যাকা রবীন্দ্রসংগীত ছিল তোমাদের জন্য, তুমি তো যাওনা—

তারপর?

মাস্টার বিজয়, কিশোরের মতো গলা— অ্যানাউন্সার ছিল মাস্টার মিলিন্দ, বাঙালি ছেলে কিন্তু কী দারুণ হিন্দি বলে!

সবাই মাস্টার! মাস্টারনি কেউ আসেনি?

কী? তোমার সব ব্যাপারেই ফাজলামি!

আমি হাসি একটু ক্লাস নাইনের সেকেন্ড টার্মিনাল দিল এবার। বাড়িতে পড়াতে আসেন তিনজন, দুটো কোচিং ক্লাসে যায়। সবসময় সিরিয়াস। ক্লাস এইটের অ্যানুয়ালে অংকে পঁচানব্বুই পেয়েছিল, সেই শোকে মা-ছেলে পুরো একদিন উপোস দিয়েছিল। পরদিন ওর মা বলল, এই শোন, ছেলের জ্যামিতিটা অন্য কারোর কাছে করাতে হবে, জ্যামিতিটায় মার খাচ্ছে, পুরো পাঁচ নম্বর চলে গেল জ্যামিতিতে। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কেন? মৃদুলবাবু তো ভালো অঙ্কে—

ভালো, কিন্তু জ্যামিতিটার জন্য অন্য কাউকে দরকার! ওটায় মৃদুলবাবু ততটা ভালো নয়!

আচ্ছা ইলা, তুমি অঙ্কে কত পেতে?

ফের পাগলামো হচ্ছে! তুমি কত পেতে?

আমি? সত্তর - আশি, ক্লাস টেনে একবার নব্বুই পেয়েছিলাম!

ওই জন্যে তুমি কেরানি হয়েছ!

ও! একশোয় যেভাবে হোক একশো পেলে কী হবে? ডাক্তার?

হোক না হোক চেষ্টা করতে হবে তো! ওদের যুগে কেরানিগিরি জুটবে? হয় ডাক্তার নয় হকার!

হকার! সেলস্-এর লাইনে আজকাল রোজগার মন্দ নয়, সেল্ ম্যানেজার হয়ে আমাদের অপু তো—

থামো! তোমার মতো মুচকুন্দ মার্কা লোক আর একটাও দেখিনি! কোথায় ছেলের কেরিয়ার নিয়ে একটু সিরিয়াসলি ভাববে, তা নয় যত...

ছেলে হকার হলে বাঁচবে তুমি?

তুমি বুঝি খুব দাঁত বের করে ঘুরে বেড়াবে?

পাঁচ নম্বর কম পেয়েছে বলে একদিন উপোস দিলে, হকার হলে তো সারা জীবনের মতো উপোষ দিয়ে...

থামো থামো! হাড়গিলে নচ্ছার একটা! এই তোমার জন্যে ছেলেটাকে ইংলিশ মিডিয়ামে দিতে পারিনি, পাতি সরকারি বাংলা স্কুলে...অথচ আমার ভাইকে দেখো, তোমার থেকে কম রোজগার অথচ সে তো সাহস করে ডোনেশন দিয়ে ঠিক ইংলিশ মিডিযামে— রিন্টু কি ঝরঝর করে ইংলিশ বলে, কী স্মার্ট!

তোমার ভাই তো এখন বড়ো ঘাটে নাও বেঁধেছে!

বেশ করেছে! মুরোদ থাকে তুমিও বাঁধো, ভাই -বৌ-র যদি আপত্তি না থাকে, তোমার কী?

বাবা, বাবা—চকে উঠি, সমু ঠেলা মারতে, জানালার ধারে বসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

কত বার ডাকছি— একডাকে যদি কোনসময় সাড়া পাওয়া যায়!

কী? বল।

আমার রোবটটা—

ও, কালকে রিন্টুকে সামলাতে বের করেছিলাম, ঠিক করে দিচ্ছি।

আ—মা—র জিনিস তুমি কেন দিয়েছ ভাইকে?

তোরই তো ভাই?

ভাই কিছু দেয় আমাকে? একটা চিপস্‌রে প্যাকেট পর্যন্ত ভাগ দিতে চায় না।

অনেক ছোট ভাই, বোঝে না।

সব বোঝে! সেলফিশ একটা।

তুই কী ফিশ? হিলসা না রুহি?

সমু আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠে— আর কোনোদিন আমার জিনিস ভাইকে দেবে না।

দাঁড়াও, রোবটটা ঠিক করে দিচ্ছি।

থাক লাগবে না...।

ফুট দুই লম্বা খেলানা রোবটটা সমুর এক মেসো সিঙ্গাপুর থেকে এনে দিয়েছিল। চারটে পেনসিল ব্যাটারি ওর পেটের মধ্যে গুঁজে দিলে রিমোট কন্ট্রোলে নানা খেলা দেখায়। কোমরের খাপ থেকে বন্দুক বার করে গুলি ছোঁড়ে, শিস দিয়ে নাচে, ঘুসিও মারতে পারে, এমনকি সিঁড়ি বেয়ে দিব্যি উঠে যেতে পারে! গায়ে ধাক্কা মারলে গুলি ছোঁড়ে, কান মুলে দিলে গোঁ গোঁ শব্দ করে। লোহার দাঁত দিয়ে যে কোন কিছু কামড়েও ধরতে পারে।

রোবটটা নিয়ে মাঝে মধ্যে সমুর মাপা অবসরের অনেকটা সময় কেটে যায়, কোন মানুষ সঙ্গীর দরকার পড়ে না। আর যাই হোক, স্কুলের সহপাঠীদের মতো রোবট তো আর সমুর কমপিটিটর নয়!

হেমন্ত - দিনের বৃষ্টি, সন্ধ্যে গড়িয়ে পড়ছে তো পড়ছেই। এখন বোধহয় আলাদা করে বর্ষাকাল বলে কিছু নেই। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে ভিজতে হল, জল ভাঙতে হল অনেকটা। স্নান করে চা-টা খেয়ে পুব-মুখো জানলায় পর্দা তুলে অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে বৃষ্টির ঝিরঝির শুনছিলাম।

ওঘরে বড়ো চড়া সুরের টিভি চলছে। বিরক্ত লাগছে। সমু সারা দুপুর - বিকেল পড়েছে, আবার শুরু করবে, তার আগে এটা এইন্টারটেনমেন্ট আওয়ার। ইলাও আছে পাশে। ওরা দুজনে দেখতে দেখতে হাসবে, কাঁদবে, প্রোগামের ভালো - মন্দ নিয়ে পরস্পর আলাপ করবে— কিন্তু আমি যোগ দিতে পারিনা। ওরা যে সব অনুষ্ঠানগুলো দ্যাখে সব কেমন ছকে বাঁধা একঘেয়ে মনে হয় আমার— টিভিতে কিন্তু ভালো প্রোগামও তো হয়, দেখতে ইচ্ছে হয় না ওদের? সবাই কী রকম জীবন উপভোগ করছে, জ্যান্ত উল্লাসের গনগনে রোদ্দুরে শরীর সেঁকে নিচ্ছে, আমি কেবল ভিজে যাই, হিমেল বাতাসে হি হি কাঁপি!

পুজোর আগে ইলার এক মাসির বাড়ি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতে হয়েছিল। মাসির নাতনির প্রথম জন্মদিন। যেতে চাইনি, তুমুল গৃহযুদ্ধের সূচনাপর্ব দেখে যেতে হল শেষ পর্যন্ত। মাসির বাড়ি ঢুকতেই সামনের লনে প্যান্ডেল, দুটো ধুমসো বক্স গাঁকগাঁক করছে, অর্কেস্টা পার্টি সুর পেটাচ্ছে! অতিথিরা কেউ কেউ সুর - তালে নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠার চেষ্টা মগ্ন, আমিই কোত্থেকে এক বেরসিক জুটেছি, ঢুকতেই মনে হল কানে সুর নয় দু-দুটো অসুর হা-রে-রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

মাসতুতো শালা খুব সেজেগুজে আপ্যায়ন করছিল, আমায় বলল, কফি নিন অশোকদা, এই এদিকে—

শালাবাবু, বলছিলাম কী—মানে যদি কিছু—

কী? বলুন।

তুলো পাওয়া যাবে?

তুলো! কোথায় কাটল?

না, না, কাটেনি, কানে দিতাম।

প্রথমে বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, এটা শ্রাদ্ধ বাড়ি নয়, বার্থ - ডে- পার্টি। মেসো - শ্বশুর অসুস্থ শুনেছিলাম।। খোঁজ করে দেখি সেদিনের মতো তাকে বাড়ির পেছনে একটা ঘুপচি ঘরে শিফট করা হয়েছে, শুয়ে আছেন, খুব রোগা হয়ে গেছেন, কথা বলার ক্ষমতা নেই। শব্দরাক্ষসের হাত থেকে বাঁচতে দরজা-জানলা বন্ধ করে রেখেছেন। আশেপাশের বাড়ির লোকজন এত আওয়াজে কেউ আপত্তি করছে না? হয়তো তারা খুশি হয়েই এই আসরে যোগ দিয়েছে। কোনক্রমে খেয়ে পালিয়ে এলাম। সারা রাস্তা অবশ্য ইলার বাক্যবাণ হজম করতে হল— হবেই, আমি তো জীবনের মজা চেটেপুটে নিতে শিখিনি। ইলা বলল, তোমাকে দেখলে মনে হয় একটা জ্যান্ত লাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িভর্তি কত লোক, হইহই করছে। আর তুমি চোরের মতো এককোণে লুকিয়ে থেকে খেয়েদেয়েই...ছিঃ ছিঃ! দিন দিন তুমি যেন আরও ঘেঁতো হয়ে যাচ্ছ!

আমি হাসি, ইলা তাতে আরও রেগে ওঠে। সুতরাং মুখে এক কুইন্টাল মেঘের মুখোশ পরে ট্যাক্সির ভেতর বোম মেরে বসে থাকি। ইলার এসব কথা এতবার শুনেছি যে আমার কীরকম ভূতের মতো হাসি আসে! 'ভূতের মতো হাসি'— এটাও ইলারই কথা।

জানালা দিয়ে অন্ধকার আর বৃষ্টি শুনি। বেশ লাগছে। জল ভেঙে ভিজে এসেছি বলে পায়ের তলায় সর্ষের তেল মেখে নিয়েছি। একটা চেয়ারে বসে সামনের চেয়ার পা তুলে দিয়ে কার্তিকের সন্ধ্যায় বৃষ্টির গুণগত— বেশ লাগছে।

টিভির ভল্যুম বাড়ল। আমার ঘরে এত বই, পত্রিকা— অথচ আর দুজন এসব ছুঁয়েও দেখে না। সমু বলে, সবসময় তো পড়ছি, ফের পড়াশুনো! একটু মস্তি করব না!

এ পড়া সে পড়াশোনা নয় রে, সুকুমার রায় পড় কিংবা বিভূতিভূষণ, আচ্ছা না হয় ফেলুদা— গোয়েন্দা-কাহিনি, খুব ইন্টারেস্টিং।

ইলা বলে, না, সিলেবাস শেষ করতেই হিমসিম, তারপরে আর ওইসব আগডুম- বাগডুম—

আমি প্রথম প্রথম হাল ছাড়তাম না, বলতাম, সমু পড়ে দেখ, মস্তি পাবি!

ইলা অনেক উঁচু থেকে মেঝেতে স্টিলের থালা পড়ার মতো আওয়াজ করে বলত, ওকি ভাষার ছিরি! মস্তি!

তোমার ছেলেই তো বলল!

ও বলে বলুক, তা বলে তুমি একটা আধবুড়ো লোক হয়ে...

টিভির আওয়াজে বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমিই বোধহয় লোকটা ভারি বে-আক্কেলে, অ্যাবনরম্যাল—বাপ বই পড়তে ভালোবাসে বলে ছেলেও তাই হবে— সে তো অন্য কিছু ভালোবাসতেই পারে। কিন্তু সে অন্য কিছু কী? সে কি মারাদোনার ফুটবল শিল্প? রশিদ খানের খেয়াল? বড্ড বাড়াবাড়ি ভাবনা হয়ে যাচ্ছে? চৌদ্দ বছরের ছেলে— তবে রুচি তৈরির একটা ব্যাপার তো থাকে। ওয়েস্টার্ন ভালো লাগে? বেশ তো, শোন সিম্পনি, বিথোভেনের মুনলাইট সোনাটা কিংবা চাইকোভস্কির সোয়ান লেক কিংবা—

ধুস! কী সব পাগলের মতো ভাবছি। আসলে পাগল নই, আমি জ্যান্ত লাশ! পাগলও তো একধরনের জ্যান্ত লাশই বটে।

ইলা গতকাল সাতদিন সময় দিয়েছে। আমাদের সাতশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ফিট অনেক পুরোনো জঞ্জালে ভর্তি হয়ে আছে—সব ফেলে দিতে হবে, ইলা বলেছে, সাতদিন সময় দিলাম, দু-একটা বই-টই বেছে রাখ, বাকি সব বিদায় কর। না করলে ইলাই দায়িত্ব নেবে।

আছে একগাদা পুরোনো পত্রিকা। বেতার জগৎ, অমৃত, দেশ, মাসিক বসুমতী— বাবা রাখতেন, বাঁধানো আছে। পত্রিকার কোন কোন পাতায়, বাবার নিজের হাতে পেন্সিলে আন্ডার লাইন করা। পুরোনো গ্রামোফোন, এখন আর বাজানো যায় না। কয়েকটি সেভেনটি এইট রেকড, লং প্লেয়িং রেকর্ড -এগুলো ঠাকুর্দার আমলের। ভাঁজ করে রাখা আছে ইজি চেয়ার— ওই তো বাবা বসে দুলছেন, স্পষ্ট দেখছি। কতটুকু জায়গা লাগে এগুলো রাখতে? সালবেড়ের বাড়িতে আরও কত কিছুই তো ফেলে এসেছি, এগুলো শুধু নিয়ে এসেছিলাম, ইলা সেদিনও আপত্তি করেছিল। জীবনে সেই - একবার ইলার সঙ্গে সমানে সামনে লড়ে গেছিলাম।

আর আছে একটা ভাঙা হারমোনিয়াম। মাঝে মাঝে বের করে এলোমেলো বাজাই আমি। মা গাইতেন এ হারমোনিয়ামে। মায়ের অপদার্থ ছেলে আমি, যদি গানটাও শিখতাম!

কোনটা ফেলব? কোনটা রাখব? একবছর ধরে চলেছে দড়ি টানাটানি—থাক, কতটুকু জায়গা নেবে? কিন্তু বাড়ির তিনজনের পার্লামেন্টে আমি সংখ্যালঘু, সিদ্ধান্ত নেবে তো সংখ্যাগরিষ্ঠরা, নিয়ম তাই, কী করি আমি? পালার্মেন্ট উড়িয়ে দিয়ে একনায়কতন্ত্র চাপিয়ে দেব, সে মুরোদ নেই আমার!

কী আর করতে পারব? আমার মতো ভিতু দুর্বল মানুষ কিছুই রক্ষা করতে পারে না, চারপাশের উল্লাসময় জীবনস্রোতের এককোণে পড়ে থাকে, স্রোতে ভাসতে পারে না আবার স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার দেওয়ার মতো বুকের পাটাও নেই! শুধু নিভৃতে এককোণে বসে ভাবে, ভাবে আর চোখের জল ফেলে।

শুধু ভাবনা, যাওয়া-আসার স্রোতের কোণায় দাঁড়িয়ে ভাবি কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব? এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারের অশিচয়তায় ভেসে যাব— মাঝের এই সময়টুকু এ কি আলোকময়, নাকি যন্ত্রণাময় এক অন্ধকার? নাকি আলোক নয়, আলো - আঁধার, যাকে জ্ঞান বা শক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না, বোধ - অনুভব দিয়ে হয়তো একটু ছোঁয়া যায়, তখন আলো - আধার থেকে উঠে আসা তীব্র যন্ত্রণা ক্রমশ ভয়ংকর ময়াল সাপ হয়ে পেঁচিয়ে ধরে, তবে কি বোধহীন অনুভবহীন হয়ে থাকাই ভালো নয়?

কিলার নিস্‌টিংক্ট কথাটা মাঝেমধ্যে অজকাল এর ওপ মুখে শুনি! এই তো সেদিন ইলার ভাই বলছিল— বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে নাকি কিলার ইনস্‌টিংক্ট নেই! ওটা না থাকলে নাকি জীবন - যুদ্ধে জেতা যায় না— হেরে গিয়ে যেমন - তেমন করে টিকে যেতে হয়।

হায় শালাবাবু! মরণকে জয় করতে পারবে তুমি! জীবনের ছদ্মবেশ ধরে যে মরণ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তোমার!

ইলার ভাই রমেন। ভালো চকরি করে। ভালো মানে এ বেলা ও বেলা প্লেনে চড়ে দিল্লি- সিঙ্গাপুর করছে এমন নয়। মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে খেয়েপরে বেঁচে থাকার মতো রোজগার। প্রাইভেট কোম্পানি, খাটায়, পয়সাও দেয়। অ্যাকাউন্টসের কাজ ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। টাকা-পয়সার হিসেব রাখতে রাখতে জীবনেও...

কী হল? জানলার ধারে বসে হাওয়া লাগাচ্ছ? বলতে বলতে টিউব - লাইট জ্বালিয়ে টেবিল - ল্যাম্প অফ করে দেয় ইলা।

হাওয়া নেই ইলা, এখানে কোথাও হাওয়া নেই।

ঠান্ডা আছে তো? একটু পরেই হাঁচতে শুরু করবে।

ইলা?

কী?

রমেনের ব্যাপারটায় তোমার অস্বস্তি হয় না...

তা হোক। তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলত?

টিভির- র হুংকার বন্ধ হয়েছে। সমু আসে। বাংলা পদ্যের দুটো প্রশ্ন বুঝিয়ে দিতে হবে। সমু, দেখ বাইরে এখনও বৃষ্টি। চুপ করে দু মিনিট বোস, বাইরে তাকা একটু— টিউব লাইটা নিভিয়ে দু মিনিট।

বাবা! আমাকে আজ রাতেই প্রশ্ন দুটো মুখস্ত করতে হবে।

করবি, দু মিনিট শুধু...

না, দু মিনিটও নয়, তুমি চেয়ার নিয়ে এসো এদিকে।

ঘরে আলো কি কমে আসছে? টিউব লাইট খুব ধীরে নিভে যাচ্ছে কি? জানালার ধার থেকে সরে এসে আত্মজের পাশে বসি আমি।

দেখ সমু! আলো কমে আসছে।

পাগল!

সুরঞ্জন কি রেগে গেল আমার ওপর? সুরঞ্জন খুব মিশুকে পরোপকারী ছেলে। ছেলে নয়, এখন লোক বলা যায়। আসলে ওরা অফিসে ছুটির পর কিছুক্ষণ থাকে। কমপিউটারে পর্ণোসিডি চালিয়ে মস্তি করে। মাঝে মাঝে পর্ণো-সাইট খোলে। আমাকেও একদিন ডেকে নিয়ে কয়েকটা স্টিল ছবি দেখিয়েছে।

এটাইও স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার ছবি নয়। অফিসে বসে এসব করা ঠিক কিনা এসব প্রশ্ন তুলিনি আমি। জীবনে সবক্ষেত্রে আমিও কি নীতি - নিয়ম বজায় রেখে চলতে পারি? তা ছাড়া, দুর্বল ভিরু লোক আমি, এই নিয়ে অফিসে শোরগোল করে ঝামেলায় পড়তে চাই না

তবে ছবিগুলো এত বিশ্রী! কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু সুরঞ্জনকে কিছু বলিনি। ওর উদ্যোগেই কো-অপারেটিভে ঢুকেছিলাম, ও ছিল বলেই নির্ঝঞ্ঝাটে এবং তুলনায় সস্তায় সুবিধাজনক জায়গায় ফ্ল্যাট পেয়েছি। যে - কোনো আপদ-বিপদে পাশে থাকে। বয়েসে আমার থেকে সাত - আট বছর ছোট। আজ টিফিনের সময় হঠাৎ বলল, আপনি সবসময় এমন মনমরা হয়ে থাকেন কেন?

মন মরে আছে তাই, হেসে বললাম আমি।

কেমন যেন বুড়োটে মেরে গেছেন। কোথাও বেরোন না, কেবল অফিস আর বাড়ি। আজ সন্ধ্যায় চলে আসুন আমার ঘরে।

তোমার ঘরে এসে রাতারাতি ইয়ং হয়ে যাব?

যাবেন। আজ ঘর ফাঁকা, বাপের বাড়ি গেছে। ভালো জিনিস খাওয়াব— হাতের মুদ্রায় বোতল বোঝায় সুরঞ্জন।

না, সুরঞ্জন থাক।

আমি নেমতন্ন করলাম, আপনি রিফিউজ করছেন?

না, মানে ওভাবে নিও না, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না একদম।

চাঙ্গা হয়ে যাবেন একদম!

না।

সুরঞ্জনের চোখ-মুখ নিভে গেল একটু। চলে গেল। অফিসে আরও দু-তিনবার মুখোমুখি হলাম, কথা বলল না। আসলে শুধু মদের আসর হলে হয়তো যেতাম। মাঝে মধ্যে ভালো জাতের হুইসকি খেতে ভালোই লাগে আমার। যদিও বছরে দু-একবারের বেশি খাই না, বেড়াতে গিয়ে আজ পুজো-টুজোর সময়, রমেন ব্যবস্থা করে। বছর দশ আগে অবশ্য আট-দশবারও হয়ে যেত। সালবেড়েতে ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে, আমার ন্যাংটোবেলার বন্ধু সুনির্মল, একটু পেটে পড়লেই চমৎকার গান ধরত, কী সুন্দর গলা! রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক— একটা গান খুব গাইত, শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'হংস পাখা দিয়ে...', সে সব দিন কোথায় চলে গেছে!

কিন্তু সুরঞ্জনের ওখানে এইসব ছবি - টবি— সে সব কোনোদিন দেখিনি তা নয়, তবে এখন বয়েসে এসে, পুরো ব্যাপারটাই কেমন একটা চূড়ান্ত অসভ্যতার মতো লাগে কতগুলো মাঝবয়সী লোক সুরঞ্জনও পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে— হুইস্কি খেয়ে ওইসব ছবি, আর যেরকম চোখ মটকে বলল— তাতে হয়তো বীভৎস গা গুলিয়ে ওঠা কোন সিডি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ও সব বীভৎস ছবির দেখার থেকে বেশ্যাবাড়ি যাওয়াও অনেক ভালো।

আমাদের অফিসে আরও অনেক আছে শুনেছি যাদের প্রতিরাতে নাকি নতুন নতুন পর্ণো-সিডি না দেখলে ঘুম আসে না! তারা অফিসে মন দিয়ে কাজ করে, বাড়ি যায় রাতে ওসব সিডি দেখে, দেখার প্রতিক্রিয়া তাদের স্ত্রী-দের কীভাবে সইতে হয় জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি, ফের সকালে উঠে নেয়ে - খেয়ে সময়মতো অফিসে আসে, মন দিয়ে কাজ করে, ডি.এ. বোনাস -এর হিসেব কষে, রাতে আবার সিডি দেখতে বসে— চমৎকার সজীব মানুষ সব! টগবগ করছে ফুটছে; জীবনকে চেটেপুটে খাচ্ছে এরা বুঝি! আমার মতো সমসময় মনমরা আধবুড়ো অসামাজিক জীবন নয়!

শুনছ?

হ্যাঁ।

আজ বর্ণালি এসেছিল।

ও।

ওদের মধ্যে গোলমাল হয়েছে।

ও। সিরিয়াস ঝগড়া!

ও।

ইলা কিছু বলতে চাইছে। একটু উৎসাহ দেখালেই কলকল করে ভাই আর ভাই-বৌয়ের ঝগড়া-বৃত্তান্ত উগরে দেবে। কিন্তু আমি তো জানি। এ তো ঘটবেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

রমেন একটা বিধবা মহিলাকে পাকড়াও করেছে। মহিলা মনে হয় পঁয়তিরিশের আশেপাশে হবেন। মৃত বরের অফিসে চাকরি পেয়েছেন। পেনসনও আছে। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়ির পারিবারিক ব্যবসার একটা আয়ের শেয়ারও পান নিয়মিত। একটি ছেলে তার। ক্লাস টেন। রমেন নাকি তার দাদার মতো। দুজনে একসঙ্গে ঘুরছে ফিরছে, সিনেমা, মার্কেটিং— সব চলছে। বর্ণালি সব জানে। আপত্তি করছে না। কারণ সেই মহিলা— কী যেন নাম, হ্যাঁ সুমনা, তিনি নানা ছুতোপাতায় দামী দামী উপহার

দিচ্ছেন বর্ণালিকে, রমেনকে নাকি প্রচুর টাকাও ধার দিয়েছেন এবং সে সব শোধ করার জন্য নয় অবশ্যই। রমেন ও বর্ণালির একটা প্ল্যানড্ গেম!

শুনছ?

বল।

ভাই আজকাল প্রায়ই রাতে বাড়ি ফিরছে না।

তাই। সে তো আগেও...

না, আগে মাসে এক - আধ দিন।

ও। তাতে বর্ণালির আপত্তি ছিল না তো? এখন কি আর দামী শাড়ি - গয়না পাচ্ছে না? এখন রমেন - বর্ণালি বনাম সুমনা কিন্তু পরে রমেনের পার্টনার বদল হয়ে যেতে পারে! গোল বাধবে তখন! ইলা আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—তোমার বড় ছোটো মন, ওদের একটা দাদা - বোনের সম্পর্ক, মেয়েটার স্বামী নেই, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও তেমন বনে না, একটু আশ্রয় চায়!

বর্ণালির গায়ে হাত তুলছে আজকাল!

হ্যাঁ, সবে শুরু, এরপর থানা-পুলিশ অনেক কিছু হবে।

আমার খুব খারাপ লাগছে...

কার জন্যে ভাই না ভাই-বৌ?

দুজনের জন্যেই।

পুরোপুরি রোবট হওনি তা হলে।

কী?

না, কিছু না। আমার খারাপ লাগছে রিন্টুর জন্যে।

ওরা সবাই মিলে ডুয়ার্সে বেড়াতে গিয়েছিল গতমাসে, তারপর থেকেই গন্ডগোল পেকেছে জানো আজ দিদিকে ফোন করেছিলাম...

ভালো আছে তো সবাই?

হ্যাঁ, তবে দিদি খুব দুঃখ করছিল।

কেন? রমেনের ব্যাপারটা জেনে?

না, না, দিদি ওসব জানে না। আলিপুরদুয়ারে গিয়েও ভাই হোটেলে ছিল, দিদিকে ফোন করেও খোঁজ নেয়নি।

দিদির গরিব ঘর দেখাতে চায়নি সুমনাকে।

দিদি কাঁদছিল।

চুপ কর, আমার এসব শুনতে আর ভালো লাগছে না...

ইলা চুপ করে না। দিদির কথা বলে যায়। আমি ভাবছিলাম, ইলাও তার দিদির খবর কতটুকু রাখে? দূরে থাকে, অভাবী, কে পাত্তা দেয়! আমিও ওদের খবর আর কতটুকু জানতে চাই। শ্বশুরমশাই গত হয়েছে প্রায় বছর দশ, শাশুড়ি-মাও চলে গেছেন তা প্রায় বছর পাঁচ-ছয় হল, তারপর থেকে ওর দিদি আর আসে না।

হঠাৎ ইলা বলল, যাক গে, শুধু শুধু অন্যের কথা ভেবে মন খারাপ করার মানে হয় না, যাদের ভাবনা তারা ভাবুক, দিদিই বা কতটুকু খোঁজ নেয়? কী ঠিক কিনা?

ইলা কেমন কত সহজে ভাই-দিদিকে 'অন্য' বলে এলোমেলো চুল গুছিয়ে নিয়ে এখন সমুর পড়াশুনার তদারক করবে কিংবা রান্নাঘরের কাজ সারবে।

ইলা ফের বলে, আজ বিকেলে হুট করে বর্ণালি এসে সমুর পড়াশোনা মাটি করল— রিন্টুটা যা বাঁদর, রোবটটা ও নেবে...সমুও ওটা ছুঁতে দেবে না...তার মধ্যে বর্ণালির ভ্যাজর ভ্যাজর— এই শোন — শুনছ?

বল।

ওই পুরোনো রাবিশগুলো কবে সরাবে? তুমি কি সরাবে নাকি আমাকেই...

থাক না, কী এমন অসুবিধা—

অসুবিধা নয়? তুমি কি রাজপ্রসাদ বানিয়েছ? একটু জায়গায়...

আচ্ছা কটা দিন যাক— আমি দেখেশুনে...

ক'টা দিন যাক বলে তো মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছ—ওসব চলবে না আর। আচ্ছা তোমার পুরোনো ব্যবহার হয় না এমন সব জিনিস পুষে রাখার স্বভাব কেন? একগাদা পেন, ওগুলো তো নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন সিডি কিনেছ, তবু টেপটা জমিয়ে...বড়ো বাজে স্বভাব তোমার!

টেপের বয়েস আর সমুর বয়েস এক, মনে আছে কত কষ্ট করে তখন ওটা কেনা হয়েছিল—কেমন মায়া পড়ে গেছে!

অদ্ভুত কথা বল— সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে দেব!

ইউজ অ্যান্ড থ্রো! আচ্ছা ইলা, ধর আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম— ধর, আর কোন কাজ হবে না আমায় দিয়ে— চিকিৎসায় সব টাকা - পয়সা শেষ—মরণ নিশ্চিত কিন্তু...

কী যে আবল..

মরব নিশ্চিত কিন্তু কবে মরব বলা যাচ্ছে না, আমায় কি তখন ছুঁড়ে...

ন্যাকা কথা রাখো তো! ঘরের কোণে ইঁদুরের মতো মরেই তো আছ। না হলে একটা হেজে যাওয়া টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে কেউ মানুষের তুলনা করে!

করে না বুঝি! ইউজ অ্যান্ড থ্রো! হাঃ হাঃ

কুকুর-বিড়াল হলেও না হয় বুঝতাম সব জঞ্জালের প্রতি মায়া—মাঝে মাঝে মনে হয় একটা বদ্ধ পাগলের সঙ্গে—

মেঝেয় হাওয়াই চপ্পলের ফটফট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যায় ইলা।

কোনো মানে নেই, অর্থহীন সব— কেন এ জীবন? কদিনের টিকে থাকা, তারপর চলে যাওয়া, কোথায়? জানা নেই।

এ পৃথিবী, সভ্যতা, সৌরমণ্ডল— কিছুই তো থাকবে না, সব কিছু খেয়ে নেবে কাল, মহাকাল। চারপাশে কত বুদ্ধিমান মননজীবী কঙ্কালের ভিড়, ইতিহাসে নাম রাখার জন্য তারা কেউ কেউ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, হায়! ইতিহাস বুঝি অমর!

বোধহীন অনুভবহীন বুদ্ধির প্রভাব! কোথাও বা বুদ্ধি নয় শুধুই চালাকি! পচে যাওয়া হেজে যাওয়া সে সব জীবন কি তাই মরণের অধিক হয়ে কখনও অমরত্বের মায়া-দরজায় নিষ্ফল মাথা কুটে ফেরে?

বাঁচতে শিখেছি কি আমরা? আমি? পেয়েছি কি জীবনের স্বাদ? রহস্যঘন আলো - আঁধারে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে পথ হাঁটতে ভয় পাই কেন? কেন হাঁপিয়ে উঠি? আচ্ছা, আমি কি পাগল? সত্যিই পাগল? নাকি চারপাশের উল্লাসদগ্ধ জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না - পারা এক বাতিল মৃত মানুষ? পাগলও অবশ্য এক অর্থে মৃতই, তবে তার সুস্থ হয়ে বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, আমি কি কিছুতেই সুস্থ হয়ে উঠতে পারি না

আমি আজকাল অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছি। মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যে মরা মানুষ থেকে দিব্যি জ্যান্ত মানুষ হয়ে উঠেছি। চুলে কলপ করি, রোজ দাড়ি কামাই, রংচঙে শার্ট পরি। অফিসে মন দিয়ে কাজ করা, বুঝে নিয়েছি আমি । সুরঞ্জনদের সঙ্গে বসে পর্ণো সিডি দেখি। নিয়মিত টিভি দেখি ইলার সঙ্গে বসে— অপরাধের সত্যঘটনা থেকে সাসুড়ি - বৌমার যুদ্ধ, কিছুই বাদ যায় না। সমুর কেরিয়ার নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা করি। জ্যামিতির জন্য ওকে আলাদা স্যার ঠিক করে দিয়েছি। বইগুলো ভাবছি পুরোনো খবরের কাগজ বেচি যার কাছে তার কাছেই বেচে দেব। ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্যে অবশ্য কিছু বই রাখব। মাঝে মাঝে ক্লাবে যাই। পরের বছর যে করে হোক পুজোকমিটিতে ঢুকতে হবে। জঞ্জাল সাফ করে ফেলেছি, টেপরেকর্ডার, বাবার ইজিচেয়ার পুরোনো পত্রিকা— সব। শুধু হারমোনিয়ামটা এখনও রয়েছে। কালকে এক হারমোনিয়াম - সারাইওলা আসবে, ও যদি দেখেশুনে কিছু মালকড়ি দিয়ে কিনে নেয়, তা হলে জঞ্জালও কমল আর কিছু পয়সাও আসল! সত্যি ইলা কিন্তু বুদ্ধিমতী!

আমি রমেনের মতো একটা সুমনা খুঁজছি, সব জায়গায় চোখকান খোলা রাখি, যেখানে দেখিবে ছাই...ইলাকে অবশ্য এ ব্যাপারটা এখনও জানাইনি, আগে খুঁজে পাই তারপর বলব।

অমি আর জানালার ধারে বসে বৃষ্টি দেখি না, বৃষ্টির শব্দ শুনি না। ছাদে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল বা কালপুরুষ খুঁজি না। কোথায় কী গাছ, কী পাখি বসল তাতে, এ নিয়ে মাথা ঘামাই না। তবে সময় বের করতে পারলে টবে ফুলের চাষ করব ভেবেছি— সময় বের করা খুব মুশকিল! সমুর কেরিয়ার নিয়ে সবসময় চিন্তায় থাকতে হয়! মানুষ না হলেও চলবে কিন্তু ভালো কেরিয়ার না হলে— উফ্! ভাবা যায় না;

এখন অনেক রাত। ও ঘরে সমু পড়ছে। ইলা আজ বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি জেগে আছি। বাবা বা মা কেউ জেগে থাকলে সমু পড়াশোনার আরও উৎসাহ পাবে। বেশ সামাজিক হয়ে উঠেছি। আগে লোকজন দেখে হাই - হ্যালো করতাম না বিশেষ। এখন এ সব রপ্ত হয়ে গেছে। আমার নিজেকে এভাবে এতটা পালটে ফেলা— কী করে সম্ভব হল? ইলা, সমু কেউ জানে না। কেন জানাব? আমি কি আর বোকা আছি আগের মতো?

দিন পনেরো আগে, গভীর রাতে না-ঘুমে ছটফট করতে করতে আমি সমুর ঘরে গিয়েছিলাম। সমু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর টেবিলের ওপর রোবটটা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পা টিপে টিপে বোবটটাকে নিয়ে ডাইনিং -এ চলে এলোম। টেবিলে রেখে ওর কাছে হাত জোড় করে বললাম, তুমিই আমাকে বাঁচাতে পার! আমার বড়ো বিপদ।

রোবট বলল, হুকুম করুন, কী করতে হবে?

হুকুম নয়, আজ থেকে তুমিই আমার মালিক, তুমিই চালাবে আমায়

রোবট বলল, বেশ, তাই হবে। আর কিছু?

আমাকে মরা মানুষ থেকে তুমি জ্যান্ত মানুষ করে দাও।

তোমার ভাঙা হারমোনিয়মটা নিয়ে এসো।

হারমোনিয়মটা...

তোমার মা যেটা বাজিয়ে গান করত

এখন নিয়ে আসব— বের করতে গিয়ে শব্দ হবে, জেগে যাবে সবাই।

কেউ টের পাবে না, আমি আছি তো!

আমি হারমোনিয়ামটা নিয়ে এলাম। রোবট বলল, এটাকে পায়ের তলায় দিয়ে দাঁড়াও তুমি—

আমি পারব না!

পারতেই হবে।

আমি হারমোনিয়মটার ওপর উঠে দাঁড়ালাম, আমার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল। রোবট আমায় ছুঁয়ে বলল, এই আমি ছুঁয়ে দিলাম তোমায়, তুমি আর কাঁদবে না।

কী আশ্চর্য! রোবট ছুঁয়ে দিতেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল, একটা বদল আসছে ভেতর থেকে টের পাচ্ছিলাম। আমি হারমোনিয়মটাকে পা দিয়ে ঠেলে সরালাম।

আরও আশ্চর্য! রোবটের চোখে জল! বিড়বিড় করছিল রোবট— অনেক হেমন্ত - রাত অনেক হিম ঋতু শীত ঋতু পেরিয়ে তবুও জীবন—

জীবন? নাকি মরণ? আমি ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না। রোবটের চোখের জল হিমজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছিল ঘরময়, ঘর কি তখন নিরালোক? মনে নেই, শুধু মনে আছে হেমন্ত-রাতের নিঝুম অন্ধকার আর হিমজল দুঃসহ মনে হয়েছিল আমার!

আজ রাতে একটু আগে স্ক্রু ডাইভার দিয়ে রোবটটাকে খুলে, নিচে নেমে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। সমু জানে না।

পারলে সেদিন রাতেই আমি ওটা গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেলতাম। এখন অনেক রাত— হেমন্তের রাত গভীর এখন, বাইরে হিমজল— বাইরে যাব না আমি, আমার নিশ্চিন্ত সতর্ক জীবন হিমজলে ভিজে উঠুক চাই না—

সিঁড়ি দিয়ে কে যেন এল বারান্দায়, বেল টিপল না, দরজায় ঠকঠক।

কে?